

প্রথম খণ্ড

[সূরা আল-ফাতিহা থেকে সূরা আল-আন‘আম পর্যন্ত]



প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
বাংলাদেশ।



মুবরক বুক্‌স প্রকাশনী
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

পবিত্র কুরআনের অর্থানুবাদসমূহের ভূমিকা মুখবন্ধ

আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা‘আলার বাণী। শব্দ ও অর্থসহ তা তিনি নাযিল করেছেন তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত, সুসংবাদদাতা, ভীতিপ্রদর্শনকারী, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উদ্দীপ্ত আলোকবর্তিকাস্বরূপ। নিম্নে সংক্ষেপে কুরআন কারীমের পরিচয় ও এর বার্তা তুলে ধরা হলো।

আল-কুরআনুল কারীমের সাধারণ পরিচিতি

এক. আল-কুরআনুল কারীমের পরিচিতি এবং এর নাম ও বৈশিষ্ট্য:

আল-কুরআনুল কারীম হচ্ছে মহান আল্লাহ্র এমন বাণী, যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত, তাঁর নিকটে এর শব্দ ও অর্থ উভয়টিই ওহী আকারে প্রেরিত, যা মুসহাফে (গ্রন্থাকারে) লিপিবদ্ধ, মুতাওয়াতির সূত্রে (সন্দেহাতীত বহু মানুষ কর্তৃক) বর্ণিত এবং যা তিলাওয়াত করা ‘ইবাদাত হিসেবে পরিগণিত।

আল্লাহু তা‘আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা ওহী আকারে প্রেরণ করেছেন, তিনি নিজেই তার নাম দিয়েছেন ‘আল-কুরআন’ (অধিক পাঠিত)। মহান আল্লাহু বলেন,

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ [الانسان: ২৩]

“নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে।” [সূরা আল-ইনসান: ২৩] কারণ, এর বিশেষত্ব এই যে, তা পাঠ ও তিলাওয়াত করতে হবে এবং কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না।

আল্লাহু তা‘আলা এর আরেক নাম দিয়েছেন, ‘আল-কিতাব’ (লিখিত গ্রন্থ)। আল্লাহু তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ [النساء: ১০০]

“আমরা তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি।” [সূরা আন-নিসা: ১০৫] কেননা এর মর্যাদা এমন যে, তা লিখতে হবে এবং একে অবহেলা করা যাবে না।

এছাড়াও আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনুল কারীমের কিছু গুণ বর্ণনা করেছেন। যেমন, ফুরকান (সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী), যিকর (স্মরণ), হুদা (হিদায়াত বা পথনির্দেশ), নূর (আলো), শিফা (আরোগ্য), হাকীম (প্রজ্ঞাপূর্ণ), মাউ‘ইয়াতুন (উপদেশ) ইত্যাদি গুণসমূহ। এগুলো আল-কুরআনুল কারীমের মাহাত্ম্য ও এর বার্তার পরিপূর্ণতার প্রমাণ।

আর ‘মুসহাফ’ শব্দটি ‘সুহুফ’ (পৃষ্ঠাসমূহ) শব্দ থেকে গৃহীত, যার উপর আল-কুরআনুল কারীম লেখা হয়েছিল। এ নামটি দ্বারা সাহাবীগণ ঐ গ্রন্থকে বুঝাতেন, যার পৃষ্ঠাসমূহে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বস্তুত আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী, যা জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾﴾ [الشعراء: ১৭২-১৭৫]

“আর নিশ্চয় এটি (আল-কুরআন) সৃষ্টিকুলের রব্ব থেকে নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত রুহ (জিবরীল) তা নিয়ে নাযিল করেছেন আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।” [সূরা শু‘আরা: ১৯২-১৯৫]

আর এ ব্যাপারে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলগণের মধ্যে নতুন নন। তাঁর রাসূল ভ্রাতৃবৃন্দ (‘আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম)-এর সবার উপরই জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট থেকে ওহী নাযিল করতেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এ মহান আমানতের জন্য যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مَنِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾
[الحج: ٧٥]

“আল্লাহ্ ফিরিশতাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেন রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।” [সূরা আল-হাজ্জ: ৭৫] তিনি ভালো করেই জানেন কে এর জন্য অধিক উপযুক্ত, আর কে এর উপযুক্ত নয়। কারণ, সকল সৃষ্টি তাঁরই তো সৃষ্টি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: ৬৮]

“আর আপনার রব্ব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন।” [সূরা আল-কাসাস: ৬৮]

দুই. কুরআনুল কারীমের নাযিল হওয়া:

৬১০ খ্রিষ্টাব্দের সতেরই রমযান সোমবার সম্মানিত নগরী মক্কার অন্যতম হেরা পর্বতের গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিলের সূচনা হয়। জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম সেখানে এই আয়াতসমূহ নিয়ে নাযিল হন,

﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ أَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

[العلق: ১-৫]

“পড়ুন আপনার রব্বের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব্ব মহা মহিমান্বিত; যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।” [সূরা আল-‘আলাক: ১-৫]

এটিই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হওয়া আল-কুরআনুল কারীমের প্রথম অংশ।

তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের

কাছে শক্তিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয়ে ফিরে এলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রাঈয়াল্লাহু ‘আনহার কাছে বর্ণনা করে তাকে বললেন, ‘আমি আমার নিজের আত্মার উপর ভয় করছি।’ তখন খাদিজা বললেন, ‘কখনো নয়, আপনি বরং সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, যারা বহন করতে অক্ষম তাদের পক্ষ হয়ে বহন করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।’ তারপর খাদিজা তাঁকে নিয়ে ওরাকা ইবন নাওফেল-এর কাছে গেলেন, যিনি সঠিক মত বা পরামর্শ ও হিকমতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। খাদিজা ওরাকাকে বললেন, ‘চাচা! আপনার ভাতিজা থেকে শুনুন।’ অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখেছেন তার সংবাদ জানালেন, তখন ওরাকা ইবন নাওফেল তাঁকে বললেন, ‘এই সে-ই নামূস^(১) যিনি মূসা ‘আলাইহিস সালামের কাছে নাযিল হয়েছিলেন। হায়! আমি যদি তখন যুবক থাকতাম, হায় আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম যখন তোমাকে তোমার জাতি দেশান্তর করবে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তারা কি আমাকে দেশান্তর করবে?’ ওরাকা বলেন, ‘হ্যাঁ, করবে। তুমি যা নিয়ে এসেছ, অতীতে যিনিই তা নিয়ে এসেছেন তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। যদি আমি সে দিন পাই, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।’ এই সাক্ষাতের কিছু সময় পর ওরাকা মারা যান।

তবে সমগ্র আল-কুরআনুল কারীম একবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়নি, যেভাবে পূর্ববর্তী নবীগণ (‘আলাইহিমুস সালাম)-এর কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছিল। বরং তা পৃথক পৃথকভাবে দীর্ঘ তেইশ বছর যাবৎ নাযিল হয়েছে। একবারে সম্পূর্ণ একটি সূরা কিংবা একটি সূরার কয়েকটি আয়াত নাযিল হতো।

(১) ‘নামূস’ শব্দ দ্বারা জিবরীল ‘আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। তিনি সেই ফিরিশতা যাকে নবীগণের কাছে ওহী নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

আল-কুরআনুল কারীম পৃথক পৃথকভাবে নাযিল হওয়ার হিকমত^(২) হচ্ছে জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম কর্তৃক পুনঃপুনঃ ওহী নাযিল হওয়ার মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর সুদৃঢ় করা, তাঁকে মজবুত করা এবং তাঁকে সাহায্য করা, যাতে তাঁকে রাসূল হিসেবে প্রেরণের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি মুশরিকদের একগুঁয়েমি ও বিরোধিতার মোকাবেলা করতে তিনি অধিক সক্ষম ও স্থির-চিত্ত হতে পারেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝﴾ [الفرقان: ৩২]

“আর কাফিররা বলে, ‘সমগ্র কুরআন তার কাছে একবার নাযিল হলো না কেন?’ এভাবেই আমরা নাযিল করেছি আপনার হৃদয়কে তা দ্বারা মজবুত করার জন্য এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।” [সূরা আল-ফুরকান: ৩২]

পৃথক পৃথকভাবে আল-কুরআনুল কারীম নাযিল হওয়ার মাঝে আরেকটি শিক্ষামূলক মহান উদ্দেশ্য ও হিকমত রয়েছে; তা হচ্ছে, দীনের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জানা ও আমল করার ক্ষেত্রে ঈমানদারদের পর্যায়ক্রমিক সুযোগ দান করা; যাতে করে তাদের জন্য দীন জানা ও বুঝা এবং পূর্বে তারা যে অজ্ঞতা, কুফর ও শিরকের অন্ধকারে ছিল তা থেকে ঈমান, তাওহীদ ও জ্ঞানের আলোয় বের হয়ে আসা সহজ হয়।

তিন. আল-কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধকরণ:

যে কোনো ভাষ্য সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে, লিপিবদ্ধকরণ। কারণ, যে কথা লিখে রাখা হয় না তা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর আল-কুরআনুল কারীম যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত

(২) দেখুন: তাফসীরুত তাবারী ১৯/১০; আবু শামা আল-মাকদিসী: আল-মুরশিদ আল-ওয়াজীয, পৃ. ২৮।

১- সূরা আল-ফাতিহা

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

সূরার নাম ও কিছু বৈশিষ্ট্য:

সূরা আল-ফাতিহা-ই সর্বপ্রথম কুরআন মাজীদে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে। [তাবারী, কাশশাফ, আল-ইতকান] সর্বপ্রথম ওহীর মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে আয়াত বা সূরার অংশ নাযিল হয় তা হচ্ছে সূরা আল-‘আলাক-এর প্রাথমিক আয়াত কয়টি। [দেখুন: বুখারী ৩] সূরা আল-মুদাসসির-এর প্রাথমিক কতক আয়াত এর কিছুদিন পর নাযিল হয়। [বুখারী ৪৯২২, ৪৯২৪] কিন্তু এই খণ্ড আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার মধ্যে একটিও পূর্ণাঙ্গ সূরা ছিল না। পূর্ণাঙ্গ সূরা প্রথম যা নাযিল হয়েছে তা হচ্ছে সূরা আল-ফাতিহা।

কুরআন মাজীদে ১১৪টি সূরার মধ্যে প্রত্যেকটির জন্য একটি নাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই নামকরণের ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু নাম আছে কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক, আর কিছু নাম রয়েছে আলেমদের ইজতিহাদপ্রসূত। কোনো কোনো সূরার নাম রাখা হয়েছে এর প্রথম শব্দ দ্বারা। কোনো সূরায় আলোচিত বিশেষ কোনো কথা কিংবা তাতে উল্লিখিত বিশেষ কোনো শব্দ নিয়ে তা-ই নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো সূরার নামকরণ করা হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ ভাবধারা ও বিষয়বস্তুকে সম্মুখে রেখে। কয়েকটি সূরার নাম রাখা হয়েছে কোনো একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি খেয়াল রেখে। সূরা আল-ফাতিহার নাম রাখা হয়েছে কুরআনে এর স্থান-মর্যাদা, বিষয়বস্তু-ভাবধারা, এর প্রতিপাদ্য বিষয় ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে। এদিক দিয়ে সূরা আল-ফাতিহার স্থান সর্বোচ্চ। কেননা অন্যান্য সূরার ন্যায় সূরা আল-ফাতিহার নাম মাত্র একটি নয়, বরং অনেকগুলো। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হচ্ছে, ১. ‘ফাতিহাতুল কিতাব’ (فاتحة الكتاب) কুরআনের চাবি-কাঠি। কেননা এই সূরা দ্বারাই কুরআনের সূচনা হয়, কুরআনের প্রথম স্থানেই একে রাখা হয়েছে। কুরআন খুলে সর্বপ্রথম এই সূরা-ই পাঠ করতে হয়। কখনও কখনও এই নামের রূপান্তর হয়ে ‘ফাতিহাতুল কুরআন’ হয়ে থাকে। এতে অর্থের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্যই সূচিত হয় না। ২. “উম্মুল কিতাব” (أم الكتاب) আরবী ভাষায় ‘উম্ম’ বলা হয় সর্বব্যাপক ও কেন্দ্রীয় মর্যাদাসম্পন্ন জিনিসকে। সৈন্য বাহিনীর ঝাণ্ডাকে বলা হয় উম্ম। কেননা সৈনিকবৃন্দ তারই ছায়াতলে সমবেত হয়ে থাকে। মক্কা নগরীর আরেক নাম হচ্ছে, ‘উম্মুল কুরা’-‘জনপদসমূহের মা’। কেননা হজের মৌসুমে সমস্ত মানুষ-সকল

ও জাতি এই শহরেই একত্রিত হয়। ইমাম বুখারী কিতাবুত তাফসীর-এর শুরুতে লিখেছেন, এর নাম ‘উম্মুল কিতাব’ এজন্য বলা হয়েছে যে, কুরআন লিখতে ও পড়তে তা-ই প্রথম এবং সালাতের কিরাআতেও তা-ই প্রথম পাঠ করতে হয়। ৩. “সূরাতুল-হামদ” (سورة الحمد)-হাম্দ তা‘রীফ ও প্রশংসার সূরা। হাম্দ এই সূরার প্রথম শব্দ। এতে আল্লাহর হামদ-তা‘রীফ-প্রশংসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে, সেজন্য এটি এ সূরার জন্য যথার্থ নাম। ৪. “সূরাতুস-সালাত” (سورة الصلاة)-অর্থাৎ সালাতের সূরা। যেহেতু সব সালাতের সব রাকাতেই এটি পাঠ করতে হয় সেজন্যই এই নামকরণ করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ অর্থাৎ, ‘যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার সালাত হবে না।’ [বুখারী ৭৫৬, মুসলিম ৩৯৪] ৫. “আস্-সাব্‘উল মাসানী” (السبع المثاني)-‘বারবার পাঠ করার সাতটি আয়াত’। সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত রয়েছে এবং তা বারবার পাঠ করা হয় বলে এর আরেক নাম ‘সাব্‘উল মাসানী’ অথবা সালাতের প্রতি রাকাতেই তা পড়া হয় বলেই এর এই নাম। [আল-কাশশাফ, বাগভী, তাফসীর ইবন কাসীর, আল-ইতকান, আত-তাফসীরুস সহীহ]

আয়াত সংখ্যা:

এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই যে, সূরা ফাতিহার মোট সাতটি আয়াত রয়েছে। এজন্য হাদীস শরীফে একে সাতটি পুনরাবৃত্তিমূলক আয়াতের সূরা السبع المثاني বলা হয়েছে। [বুখারী ৪৭০৩] আল কুরআনেও একে এ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। [সূরা আল-হিজর: ৮৭] এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে, সূরার পূর্বে যে “বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম” উল্লেখ করা হয়েছে তা সূরা ফাতিহার মধ্যে গণ্য আয়াত ও এর অংশ, না তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোনো জিনিস? এর উত্তরে বলা যায়, কোনো কোনো সাহাবী “বিস্মিল্লাহ”কে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করতেন। পক্ষান্তরে অপর সাহাবীগণের মতে এটি এ সূরার অংশ নয়। তবে মদীনা মুনাওয়ারায় সংরক্ষিত কুরআনে এটিকে সূরা আল-ফাতিহার অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাছাড়া অধিকাংশ কিরাআতেও এটিকে সূরার প্রথমে একটি আয়াত ধরা হয়েছে এবং “সিরাতাল্লাযীনা আন‘আমতা ‘আলাইহিম গাইরিল মাগদূবি ‘আলাইহিম ওলাদ দাল্লিন” পর্যন্ত পুরোটাকে একই আয়াত ধরা হয়েছে। আর যারা বিস্মিল্লাহকে সূরার আয়াত হিসেবে গণ্য করেননি তারা ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ পর্যন্ত এক আয়াত, আর তার পরের অংশ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ কে আলাদা আয়াত সাব্যস্ত করে সাত আয়াত পূর্ণ করেছেন। [বাগভী]

নাযিল হওয়ার স্থান:

গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, সূরা আল-ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। অবশ্য কেউ

বলেছেন, এটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কারও মতে এটা একবার মক্কায় এবং আরেকবার মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তাছাড়া এর অর্ধেক মক্কায় এবং অপর অর্ধেক মদীনায় নাযিল হয়েছে বলেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এসব মত গ্রহণযোগ্য নয়। তার বড় প্রমাণ এই যে, সূরা আল-হিজর সর্বসম্মতভাবে মাক্কী। তার ৮৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে “আমরা আপনাকে সাতটি বারবার পঠনীয় আয়াত ও কুরআনে ‘আযীম প্রদান করেছি।” এই বারবার পঠনীয় সাতটি আয়াতই হলো সূরা আল-ফাতিহা। [বাগভী] তাছাড়া সালাত মক্কায়ই ফরয হয়েছিল এবং সূরা ফাতিহা ছাড়া কখনই সালাত পড়া হয়নি -এটাও সর্বসম্মত কথা।

সূরার ফযীলত:

সূরা আল-ফাতিহার ফযীলত বর্ণনায় অসংখ্য হাদীস এসেছে। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে সালাতকে আমি দু’ভাগে বিভক্ত করেছি, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়। বান্দাহ $\langle \text{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} \rangle$ বললে আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে; আর যখন সে $\langle \text{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} \rangle$ বলে তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমার গুণ-গান করেছে। আর যখন সে বলে $\langle \text{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} \rangle$ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমাকে সম্মানে ভূষিত করেছে। আর যখন সে বলে $\langle \text{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} \rangle$ তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়। আর যখন সে বলে $\langle \text{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ وَلَا الضَّالِّينَ} \rangle$ তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য আর আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে চায়।” [মুসলিম ৩৯৫] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা‘আলা উম্মুল কুরআন এর অনুরূপ কোনো কিছু তাওরাত ও ইঞ্জীলে নাযিল করেননি। আর তা হলো পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত, যা আমি (আল্লাহ) এবং বান্দাদের মাঝে দু’ভাগে বিভক্ত।” [নাসায়ী ৯১৩, তিরমিযী ৩১২৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরীল ‘আলাইহিস্ সালাম উপবিষ্ট ছিলেন। তখন হঠাৎ উপরের দিকে (এক ধরনের) শব্দ শোনা গেল। তখন জিবরীল ‘আলাইহিস্ সালাম আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, এটা আকাশের একটি দরজা যা কখনও খোলা হয়নি। ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, অতঃপর সে দরজা দিয়ে একজন ফিরিশতা অবতরণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে

আমি আপনাকে দু'টি নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি যা আপনাকে দেয়া হয়েছে, যা আপনার পূর্বে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। সূরা আল-ফাতিহা ও সূরা আল-বাকারাহ্ এর শেষাংশ। এর একটি অক্ষর পাঠের মাধ্যমে চাওয়া বস্তুও তাকে দেয়া হবে। [মুসলিম ৮০৬] অনুরূপভাবে আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে এক জায়গায় অবতরণ করলাম। সেখানে একটি মেয়ে এসে বলল, এ গ্রামের প্রধানকে সাপে দংশন করেছে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি ঝাঁড়-ফুক করার মতো আছে? তখন মেয়েটির সাথে এক ব্যক্তি গিয়ে তাকে ঝাঁড়-ফুক করে এলো, আমরা তাকে ঝাঁড়-ফুক জানে বলে মনে করতাম না। এতে গ্রাম প্রধান আরোগ্য লাভ করে। ফলে সে তাকে ত্রিশটি বকরী উপহার দিল এবং আমাদেরকে দুধ পান করাল। আমাদের সঙ্গীকে আমরা বললাম তুমি কি ভালো ঝাঁড়-ফুক করতে জানো? সে বলল, আমি শুধু উম্মুল কুরআন দ্বারা ফুক দিয়েছি। আমরা সবাইকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তোমরা এগুলোকে কিছু কর না। অতঃপর মদীনা পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন, সে কীভাবে জানলো যে, এটি একটি ঝাঁড়-ফুক করার বিষয়! তোমরা এগুলো বন্টন করে নাও এবং আমাকে তোমাদের সাথে এক ভাগ দাও। [মুসলিম ২২০১] অন্য বর্ণনায় আবু সাঈদ ইবনুল মু'আল্লা বলেন, আমি সালাত আদায় করছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি সালাত শেষ করেই তার ডাকে সাড়া দিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, আমার কাছে আসা থেকে তোমাকে কিসে বারণ করেছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি যে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন তোমাদেরকে ডাকেন সে বস্তুর দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি তোমাকে কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরা শিক্ষা দিব।' ... অতঃপর তিনি বললেন, তাহলো, ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾। এটি হলো সাতটি পুনঃপুনঃ পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন যা আমাকে দান করা হয়েছে। [বুখারী ৪৬৪৭] উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সূরাটি সবচেয়ে মহান সূরা।

এ সূরা যদিও আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব কালাম, তবুও এর ধরন রাখা হয়েছে প্রার্থনামূলক। আল্লাহর নিকট মানুষকে কোন জিনিসের প্রার্থনা করতে হবে, সে প্রার্থনার নিয়ম ও প্রণালী কী হওয়া উচিত; আল্লাহর সম্মুখে মানুষের প্রকৃত

কোথায় এবং সেই দৃষ্টিতে মানুষের আকীদাহ-বিশ্বাস কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তার জন্য বিশুদ্ধ দীন কী হতে পারে, এই দুনিয়ার অসংখ্য পথের মধ্যে হিদায়াতের পথ (আল্লাহর সন্তোষ লাভের সঠিক পথ) কোনটি, আর কোন পথে নাযিল হয় তাঁর অভিশাপ; এসব কথাই বিশ্ব-মানবের সম্মুখে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এই সূরার মাধ্যমে। আল্লাহর বিশেষ পরিচয় ও গুণাবলির অনিবার্য পরিণতি হিসেবে কিয়ামত-বিচারের দিন এবং রিসালাত ও নবুওয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে। এসব দিক দিয়ে এ সূরাকে কুরআনের ভূমিকা বলা যেতে পারে। কুরআনের সমগ্র সূরার মধ্যে এর গুরুত্ব বেশি হওয়ার কারণেই একে কুরআনের শুরুতে স্থাপন করা হয়েছে। অন্য কথায় ত্রিশ পারা কুরআন মাজীদে যা কিছু আলোচিত হয়েছে, অতি সংক্ষেপে তাই বর্ণিত হয়েছে এ ছোট সূরাটিতে অথবা বলা যায়, পূর্ণ কুরআন এ ছোট সূরাটিরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

১. রহমান, রহীম^(১) আল্লাহর নামে^(২)



(১) সাধারণত আয়াতের অনুবাদে বলা হয়ে থাকে, পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এ অনুবাদ বিশুদ্ধ হলেও এর মাধ্যমে এ আয়াতখানির পূর্ণভাব প্রকাশিত হয় না। কারণ, আয়াতটি আরও বিস্তারিত বর্ণনার দাবী রাখে। প্রথমে লক্ষণীয় যে, আয়াতে আল্লাহর নিজস্ব গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে ‘আর-রাহমান ও আর-রাহীম’ এ দু’টি নামই এক স্থানে উল্লেখ হয়েছে। ‘রহম’ শব্দের অর্থ হচ্ছে দয়া, অনুগ্রহ। এ ‘রহম’ ধাতু হতেই ‘রহমান’ ও ‘রহীম’ শব্দদ্বয় নির্গত ও গঠিত হয়েছে। ‘রহমান’ শব্দটি মহান আল্লাহর এমন একটি গুণবাচক নাম যা অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা জায়েয নেই। [তাবারী] কুরআন ও হাদীসে এমনকি আরবদের সাহিত্যেও এটি আল্লাহ ছাড়া আর কারও গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। পক্ষান্তরে ‘রহীম’ শব্দটি আল্লাহর গুণ হলেও এটি অন্যান্য সৃষ্টজগতের কারও কারও গুণ হতে পারে। তবে আল্লাহর গুণ হলে সেটা যে অর্থে হবে অন্য কারও গুণ হলে সেটা সে একই অর্থে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রত্যেক সত্তা অনুসারে তার গুণাগুণ নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এখানে একই স্থানে এ দু’টি গুণবাচক নাম উল্লেখ করার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, আল্লাহ ‘রহমান’ হচ্ছেন এ দুনিয়ার ক্ষেত্রে, আর ‘রাহীম’ হচ্ছেন আখেরাতের হিসেবে। [বাগভী]

(২) নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সর্বপ্রথম ‘ইক্ৰা বিস্মি’ বা সূরা আল-‘আলাক এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। এতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নাম নিয়ে পাঠ শুরু করতে বলা হয়েছিল। সম্ভবত এজন্যই আল্লাহর এই প্রাথমিক আদেশ অনুযায়ী কুরআনের প্রত্যেক সূরার প্রথমেই তা স্থাপন করে সেটাকে রীতিমত পাঠ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ বিসমিল্লাহ প্রত্যেকটি সূরার উপরিভাগে